East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

প্রথম আলো

প্রথম আলো, ০৭-০৮-২০২২, পৃষ্ঠা- ০১, ০২

কেরোসিন ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিপক্ষে আমি

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
সাবেক গভর্নর,
বাংলাদেশ ব্যাংক

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

পেট্রল ও অকটেনের দাম বাড়ানো যৌক্তিক হয়েছে। কেরোসিনের দাম বাড়ানো ঠিক হয়নি। আর ডিজেলে ভর্তুকি দিতে হবে, না হলে অসুবিধা হবে। পেট্রল ও অকটেনের মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবনে কোনো প্রভাব পড়বে না। অকটেন যাঁরা ব্যবহার করেন, তারা অনেকেই বিত্তবান। তাঁদের ওপর মূল্যবৃদ্ধির কোনো প্রভাব পড়বে না। এতে পেট্রোবাংলার রাজস্ব অবশ্যই বাড়বে। পেট্রল ও

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

কেরোসিন ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিপক্ষে আমি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অকটেনের দাম আগে অনেক সহনীয় ছিল। এটা বৃদ্ধির খুব দরকার ছিল। কারণ, দুই প্রতিবেশী দেশের তুলনায় এখানে দাম কম থাকায় পেট্রল, অকটেন ও ডিজেল পাচার হয়ে যাচ্ছিল।

ডিজেলের দাম এতটা বাড়ানো মোটেও ঠিক হয়নি। শতকরা ১০ ভাগ বাড়ালে ভালো হতো। ডিজেলের দাম ব্যবস্থাপনা করাটা কঠিন। কারণ, ডিজেল দিয়ে একদিকে বাস-ট্রাক চলে, বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, আবার কৃষি ও অন্যান্য পণ্য পরিবহনের মতো খাতেও ব্যবহার করা হয়। আবার ডিজেল খাতভিত্তিক আলাদা করে বিক্রি করাটাও কঠিন। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো খাতে ভর্তুকি অবশ্যই দিতে হবে। আর ভর্তুকি মানেই দুর্নীতি, তাতে লাগাম দিতে হবে। এ জন্য আমি নিজেও ডিজেল ও কেরোসিনের দাম বাড়ানোর বিপক্ষে। আমার মনে হয়, এই দুটি পণ্যের দাম বাড়ায় জনগণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই প্রভাবকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য নীতিনির্ধারকদের চিন্তাভাবনা করতে হবে। যাতে পণ্য পরিবহন, বিদ্যুৎ ও কৃষি উৎপাদনে এর বিরূপ প্রভাব না পড়ে।

আর কেরোসিন একেবারে প্রান্তিক ও গরিব মানুষের পণ্য। তাই কেরোসিনের দাম বাড়ানো একদমই ঠিক হয়নি। কেরোসিনের দাম যেখানে আছে, সেখানেই রাখা উচিত ছিল। বঙ্গবন্ধুও কেরোসিনের দাম কখনো বাড়াননি। শেখ হাসিনা সরকার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে অন্যান্য জ্বালানিসামগ্রীর দাম বাড়ালেও কেরোসিনের দাম বাড়াননি। এটা থেকে তেমন রাজস্ব বৃদ্ধিও আশা করা ঠিক না। এটার দাম না বাড়ানোই ভালো ছিল।

বাংলাদেশ অনেক কিছু সময়মতো না করে আটকে রাখতে চায়। এ কারণে অষ্টম বেতন কমিশনে বেতন দ্বিগুণ করতে হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারেও একই ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে গত ১০ বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছে মাত্র ২২ ভাগ, আর ভারতে কমেছে ৪৭ ভাগ। আমি এটা সাম্প্রতিক হট্টগোলের আগের হিসাব বলছি। কাজেই কেরোসিন বাদে অন্য জ্বালানিসামগ্রীর দাম অনেক আগেই বাড়ানো উচিত ছিল। ফলে যখন দাম বাড়াতে হয়েছে, তখন বড় পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হয়েছে। এই সমন্বয়টা গত তিন বছরে যদি অল্প অল্প করে হতো, তাহলে এত বাড়াতে হতো না। তবে মূল্যবৃদ্ধি আটকে রাখা হয়েছিল, জনজীবনে কষ্ট হবে তা ভেবে। এ জন্য রাজনৈতিক সরকারের এখন এত বেশি দাম না বাড়িয়ে কোনো উপায় ছিল না।

আমার তো মনে হয় না, এটা শুধু আইএমএফের ঋণের জন্য জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়েছে। আমি মনে করি, কর-জিডিপি অনুপাতে যে দুরবস্থা, এত বেশি পৃথিবীতে কোথাও নেই। সেটাও আমলে নিতে হয়েছে। এ জন্যও এভাবে দাম বাড়াতে হয়েছে। তবে বিপিসিকে চাপ দিয়ে মুনাফার শতকরা ৫০ ভাগ সরকারের ঘরে তুলতে হবে।

রাজস্ব সংগ্রহে যে অদক্ষতা আছে, তার প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর গিয়ে পড়ল। আমি সারা জীবন চিৎকার করে এলাম, অর্থ পাচার বন্ধ করো। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে সরকারের উচ্চপর্যায় থেকেও বলা হচ্ছে, সম্ভবত দেশের বাইরে সম্পদ ও মুদ্রা পাচার হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য আমদানি হু হু করে বাড়ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে লেনদেন ভারসাম্যে যে ঘাটতি হয়েছে, প্রবাসী আয় দিয়েও আগের মতো তা সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। অর্থ পাচার দেশের একটা বড় সমস্যা। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) হিসাবে বছরে ৬-৭ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আমদানিনির্ভর দেশ বলে যে মিথ চালু আছে, সেটা আসলে আমদানি বৃদ্ধির ফলে হয়েছে। সাধারণভাবে ৩৫-৩৮ শতাংশ আমদানি হলো ভোগ্যপণ্য ও অপ্রয়োজনীয়। টাকার মান বৃদ্ধি মানেই অর্থনীতি শক্তিশালী হয়, এটা একেবারেও সঠিক নয়। জাপানের সদ্য প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ক্ষমতায় এসে ইয়েনের মান ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেন এবং ব্যাংকগুলো জনগণকে সুদ দিতে শুরু করে। এর ফলে তারা প্রবৃদ্ধির মুখ দেখেছে। এখানে আমদানি কমাতে সঠিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা আরও জোরদার করা দরকার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। ৯০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে রিজার্ভ নেমে এসেছিল ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে। তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ১৫ লাখ টন চাল মজুত করেছিল। এভাবে যদি খাদ্য মজুত থাকে এবং উন্নয়নকাজের জন্য প্রয়োজনীয় আমদানি পণ্য আসতে থাকে, তাহলে বাড়তি রিজার্ভ অপরিহার্য নয়। কাজেই রিজার্ভ একটু কমলে-বাড়লে কিছু যায় আসে না। বরং এখন দরকার হলো সুদহারের ছয়-নয় উঠিয়ে দেওয়া। নইলে মূল্যস্ফীতি কমবে না। জনগণের ভোগ্যপণ্যের ওপর বিধিনিষেধ দিয়ে মূল্যস্ফীতি কমানো যাবে না। মূল্যস্ফীতি কমাতে হলে প্রথমেই মুদ্রাস্ফীতি কমাতে হবে। সে জন্য সুদের হার বাড়ানো প্রয়োজন। এতে সঞ্চয় বাড়বে, তবে বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। এতে এক-দুই বছরের জন্য প্রবৃদ্ধি কিছুটা কম হবে। পৃথিবীর সব দেশে মূল্যস্ফীতি কমাতে সুদহার বাড়ানো হয়েছে।

এখন অর্থ পাচার, কর ফাঁকি ও ঋণখেলাপি ন্যূনতম পর্যায়ে নিতে জোরালো পদক্ষেপ প্রয়োজন।